Bhatter College Journal of Multidisciplinary Studies | ISSN 2249-3301, Vol. VII, Number 2, 2017
A Refereed Journal, approved by the UGC & included in Google Scholar
Article url: www.bcjms.bhattercollege.ac.in/v7/n2/v7n2bnl03.pdf
Article DOI: 10.25274/bcjms.v7n2.v7n2bnl03

জাতীয়তাবাদী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর শিক্ষাভাবনা

প্রণব বর্মণ

ভট্টর কলেজ, দাঁতন, Email: talktopranab@gmail.com

সংক্ষিপ্তসার (Abstract):

ঔপনিবেশিক শক্তির হাত ধরে উনিশ শতকে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। মধ্যযুগীয় সামাজিক উপাদানগুলি অপসারিত হয়ে, যুক্তিবাদ, সুগঠিত রাষ্ট্র পরিকল্পনা ও জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি বাঙালির মনে সঞ্চারিত হয়। অবশ্যই এর মাধ্যম ঔপনিবেশিক শাসন ও ইংরেজী শিক্ষা। এই ইংরেজী শিক্ষাকে অবলম্বন করে সমাজে উদ্ভব হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মত নব্য শ্রেণীর। জাতীয়তাবাদ ও ইউরোপীয় চিন্তাভাবনার মিশেল ঘটে বাংলার সমাজে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যুথবদ্ধতায় সমাজে নতুন সম্ভাবনার প্রকাশ পেতে থাকে। বাঙালি মননের গড়ন নির্মিত হয় নতুন উপকরণ দ্বারা। এর প্রভাব পড়ে শিক্ষাচিন্তার ওপর। শিক্ষার প্রসারের মধ্যদিয়ে বাঙালি তথা ভারতীয়দের মধ্যে জাতি ও জাতীয়তাবোধ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ব্রিটিশ শক্তির প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও বাংলার শিক্ষাচিন্তাকে জাতীয়তাবাদী খাতে প্রবাহিত করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বাংলা তথা ভারতে শিক্ষাচিন্তায় আমূল পরিবর্তন আনেন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঔপনিবেশিক ধারায় প্রবাহিত না করে স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তনের পথপ্রদর্শক ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। পরাধীন ভারতে তাঁর জাতীয়তাবাদী মন নিয়ে কীভাবে শিক্ষাকে অবলম্বন করে সমাজ সংস্কারের প্রতি ব্রতি হয়েছিলেন সেটা এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

সূচকশব্দ: ঔপনিবেশিক শক্তি, জাতীয়তাবাদ, শিক্ষা , কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

পার্থ চ্যাটার্জী বা আশিষ নন্দী প্রমুখরা বলেন, উনিশ শতকে ইংরেজী শিক্ষিতরা ভারতে জাতীয়তাবাদ প্রসারের মূল ভূমিকা পালন করেন। যদিও ব্রিটিশ সরকারের ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের ও শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য ছিল ভারতীয়দের ব্রিটিশ সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত করা যাতে করে সাম্রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণে সুবিধে হয়। সামগ্রিক বিচারে বলা যায় (জাতীয়তাবাদীরা মনে করে), ব্রিটিশ শাসিত ভারতের শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণভাবে অবিন্যস্ত। ঔপনিবেশিক ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় অবহেলিত হয় ভারতের সংস্কৃতি ও পরম্পরা। যদিও বিভিন্ন কারণে (আর্থিক সুবিধার জন্য) বহু ভারতীয়দের ইংরেজী শিক্ষা নীতির গ্রহণ ও অনুকরণে কোন খামতি ছিল না। এই সময় (উনিশ শতক) থেকে সমাজে প্রগতিশীলতার ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়রা। এই ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়রা হয়ে ওঠেন ব্রিটিশ শাসনের প্রধান স্তম্ভ। সকলের একই স্রোতে গা ভেসে গিয়েছিলো তেমন নয়। এর মধ্যে কয়েকটি ব্যতিক্রমী চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়, যারা সমাজে স্বতন্ত্র চিন্তার ছাপ ফেলে গেছেন। তাঁর মধ্যে

অন্যতম হলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত স্রোতে হেঁটে স্বতন্ত্র শিক্ষানীতির প্রবর্তক হয়ে ওঠেন। ইংরেজী শিক্ষাকে প্রয়োগ করেছিলেন জাতীয়তাবাদের প্রসারে। ঔপনিবেশিক ভারতের উচ্চশিক্ষা নীতির প্রণয়নের জন্য ভারতীয় হিসাবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর মধ্যে থেকে দুই ভিন্ন সংস্কৃতির মেল বন্ধন ঘটাতে সচেষ্ট ছিলেন। জোর দিয়েছিলেন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসারের। বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও বিরোধ সত্ত্বেও একজন ভারতীয় তথা বাঙালি ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে জাতীয়তাবাদের বিকাশের ধারা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। তবে এই জাতীয়তাবাদের মূল উৎস কোথায় তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। বিশেষতঃ আশিষ নন্দী বা সি এ বেইলি প্রমুখরা বলেন, 'ভারতবর্ষের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত রাজনৈতিক নেতারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন'।[১] অপরদিকে ভ্যালেনটাইন চিরলদের মত পন্ডিতরা ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের ভূমিকাকে অস্বীকার করেন। তবে এই বিতর্ক আলোচনা করা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়।

সুবিদিত যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহায়তায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ভীত শক্ত হয়েছিল। আবার উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদী বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এটা অনস্বীকার্য যে একদল ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা গুরুত্ব দেয় দেশীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে। এদের কাছে হিন্দু অতীত ও ঐতিহ্যের গৌরব জাতীয়তাবোধের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।[২] এই সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন বরেণ্য পন্ডিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে পরাধীন জাতির হীনম্মন্যতাকে কাটিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পরাধীন ভারতে শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন, সেটাই এই প্রবন্ধের মূল আলোচনার বিষয়।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দৃঢ়তা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়, যখন কার্জন সাহেব দেশে ফেরার পর, এক বন্ধু তাকে প্রশ্ন করেন, ভারতে আপনি কি দেখে এলেন? উত্তরে কার্জন বলেন, মাত্র আড়াইখানা মানুষ দেখেছি সেখানে দুজন পূর্ণ মানুষ একজন অর্ধ মানুষ। এই দুজনের মধ্যে একজন হলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

১৮৬৪ সালের ২৯ জুন বউবাজার ১৭নং মলঙ্গী লেনের গৃহে সোমবার এই ক্ষণজন্মা পৃথিবীর আলো দেখেন। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ ছিলেন উনিশ শতকের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। এই আধুনিক মনস্ক পিতা ছিলেন তাঁর সমকালের রোল মডেল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনে পিতার প্রভাব সম্পর্কে মহেন্দ্র বিদ্যানিধি বলেন,- পিতৃদেব পরীক্ষা গৃহে ইলেকট্রিক ব্যাটারি লইয়া উপস্থিত হইতেন। পুত্রের শরীরে ব্যাটারি সংলগ্ন করিয়া দিলে এক ঘন্টা লেখা চলিত। তথাপি তিনি তৃতীয় হইয়া পঞ্চবিংশতি মুদ্রার বৃত্তিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন।[৩] শৈশবকাল থেকেই মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কলেজ জীবনে তাঁর চিন্তা-ভাবনা বিকশিত করার ক্ষেত্রে অধ্যাপক হিসাবে পান ভূপেন্দ্রনাথ বসু, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত' এর মত পন্ডিতদের। কলেজ জীবন থেকে তার প্রতিভার খ্যাতি বাংলার বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

উনিশ শতকের ইউরোপের বিজ্ঞানচর্চার প্রভাব পড়ে ভারতীয় শিক্ষার ওপর। ভারতের ছাত্রবৃন্দের মধ্যেও আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার প্রতি আকর্ষণ কম ছিলনা। তাঁর অন্যতম ফসল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বিশেষ করে আধুনিক গণিতচর্চার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল চোখে পড়ার মত। বিশিষ্ট গণিতবিদ গনেশ প্রসাদ ভারতীয়দের মনে করিয়ে বলেন, 'গণিত শাস্ত্রে স্যার আশুতোষে যতটুকু দান করেছেন, সে তাঁর ছাত্র বয়সে একক প্রচেষ্টার ফলসরূপ। প্রাচীন গণিতবিদ ভাস্করের পরবর্তীকালে তিনি হলেন প্রথম ভারত সন্তান যিনি গাণিতিক গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন যা মৌলিক বলেই মূল্যবান'।[৪] বিশ্বের দরবারে তাঁর গাণিতিক সূত্র 'Mookerjee's Theorems' নামে সুপরিচিত। শুধুমাত্র পাশ্চাত্য বিজ্ঞান নয় প্রাচ্যবিদ্যাচর্চাকে ভিত্তি করে ভারতের গণিতচর্চাকে উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন।

তিনি কেবল গণিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, আইন শাস্ত্রের ওপরেও যথেষ্ট কৃতিত্বের ছাপ রেখে যান। তাঁর আইন বিদ্যার গভীরতা সম্পর্কে যাদবেশ্বর তর্করত্ন বলেন – আশুতোষ আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্যার রাসবিহারী ঘোষের নিকট আর্টিকেল ক্লার্ক হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে আদালতে আশুবাবু জজ হয়েছিলেন ও রাসবিহারী উকিল ছিলেন। তখন রাসবিহারী তাঁর মক্কেলকে বলিতেন বেঞ্চে যদি আশুতোষ উপস্থিত না থাকেন, তবে নিশ্চয় আমি তোমাকে জয়ী করিতে পারিব, কিন্তু আশুতোষ থাকিলে পারিবনা'।[৫] তিনি আইনকে ব্যবসা নয় বা কেবল গুরুগম্ভীর কথার কারবার নয়, আইনকে বিজ্ঞানের স্তরে উন্নিত করেন। আইন শাস্ত্রের পারদর্শিতার জন্য তাঁর প্রাপ্তি ঘটে 'দেশিকোত্তম' উপাধি। তিনি বিবেচিত হয়েছিলেন 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' হিসাবে। আইন সংস্কারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছাত্র জীবনে কেবলমাত্র অধ্যয়ণে নিমগ্ন থাকতেন এমন নয়। জাতিয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সলতে পাকানোর কাজটা শুরু করেন ছাত্র-জীবনে। ঔপনিবেশিক আমলে দেশের প্রতি ভালোবাসা বা ভারতীয়দের জাতি গঠন সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ছিলেন। স্কুল জীবনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে একনিষ্ঠ সক্রীয় কর্মী ছিলেন। তাঁর এই চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, যখন- জাতীয়তাবাদী নেতা সুরেন্দ্রনাথকে তৎকালীন রাষ্ট্রশক্তি জেলে পাঠালে যুব সমাজের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সুগঠিত হয়। সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎএর দিকে না তাকিয়ে আন্দোলনের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এই আন্দোলনের তীব্রতা দেখে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় অকপটে স্বীকার করে বলেন,

> "In the demonstration that followed the sentence they took a leading part in a fashion common among young men all over the world, smashing windows and pelting the police with stones. One of those rowdy youths was Ashutosh Mukherjee." [৬]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ কর্মজীবন (১৯০৩-১৯২৩) হাইকোর্টের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তাঁর প্রাণ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮৮৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের সদস্য হিসাবে মনোনীত হওয়ার পর থেকে ভারতের শিক্ষার সংস্কারের মধ্যদিয়ে দেশ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে তার বেশিরভাগ জীবন অতিবাহিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ছিল তাঁর কাছে মাতৃ স্বরূপ। অপর দিকে তিনি ছিলেন কেবল শিল্পী।

আজীবন প্রতিষ্ঠানরূপ মাতার দেহে অলঙ্কার পরিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সদা ব্যস্ত ছিলেন। বিশ্বের দরবারে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্নত করেছিলেন। দীর্ঘদিন এখানে তিনি নিভৃত সাধনায় সমাহিত ছিলেন।[৭] এই পথ খুব একটা মসৃণ ছিল তেমন নয়। একদিকে স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ ও ছাত্রদের কলেজ বয়কটের ডাক, অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে রাজনৈতিক কোন্দল। এই দ্বিবিধ সংকটের সম্মুখীন হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অস্থির পরিস্থিতি থেকে মুক্তির পথ বাতলে দেওয়ার জন্য রিজলি সাহেব নিদান দেন- ভাইস চ্যান্সেলার হিসাবে একজন হাইকোর্টে এর জজ'কে নিযুক্ত করার বহু সুবিধা। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনেট ও রাজনৈতিক কারণ নিয়ে যারা মাতামাতি ও দলাদলি করেন, তাদের অধিকাংশ সদস্যই হাইকোর্টের উকিল কিংবা ব্যারিষ্টার। সরকার যদি কোনো উচ্চ পর্যায়ের আমলাকে ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত করেন তাহলে এইসব বিরোধী ভাবাপন্ন সদস্যদের বাগে রাখা যায়।[৮] রিজলি সাহেবের পরামর্শে ১৯০৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসাবে নিযুক্ত হন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

উপাচার্য হিসাবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জোর দেন ১৯০৪ এর বিশ্ববিদ্যালয় আইনকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য। এই আইনে বলা হয়[৯] –

১. ছাত্রদের মাতৃভাষার জ্ঞানের ওপর জোর দিতে হবে।

২. ছাত্রদের প্রবেশিকা বাদে অন্যান্য পরীক্ষায় নৈপুণ্যের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৩. পি.এইচ.ডি ও ডি.এস.সি উপাধি প্রবর্তনের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ও বিজ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা করতে হবে ও স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ, অধ্যয়ণ ও গবেষণার বিষয়ে জোর দেওয়া অত্যন্ত জরুরী বলে উল্লেখ করা হয়।

আইনের শর্তগুলি অধিকাংশ আশুতোষের মস্তিষ্কপ্রসূত বলে শিক্ষা মহলে প্রচলিত ছিল। এই আইনের খসড়া তৈরি করতে গিয়ে কার্জন সাহেবের সঙ্গে আশুবাবুর মতান্তরের গল্প সকলের জানা। নানা বিরোধ সত্ত্বেও ভারতীয়দের স্বার্থে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য স্পষ্ট মত প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেননি আশুতোষ মুখার্জি। তবে কার্জন সাহেব অকপটে স্বীকার করেন,-'এইসব বিধিব্যবস্থার মূলে রয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের জনৈক প্রাজ্ঞ বিচারক মহোদয়ের উদ্ভাবনী দক্ষতা।[১০] এই প্রস্তাবগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার পশ্চাতে ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে অগাধ স্বপ্ন। তাই ঘোষণা করেন, ' We are no longer a pure examining body prescribing courses of study, fixing standard, testing candidates and putting the seal of our approval on them'।[১১] তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মানের উৎকর্ষ সাধনের ওপর জোর দেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পঠন পাঠনের পাশাপাশি জোর দেন নানাবিধ বিষয়ের গবেষণার ওপর। ছাত্রদের উদ্ভাবনী ভাবনাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ডক্টর অফ ফিলসফি ও ডক্টর অফ সায়েন্স' এর মত মহাসম্ভ্রম সূচক উপাধি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ভারতের মত পরাধীন দেশে শিক্ষানীতির প্রণয়ন দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার মানুষকে মনে করিয়ে দেন – বিশ্ববিদ্যালয়ের অগৌরব ঘোচাবার জন্যে পরীক্ষার শেষ দেউড়ি পার করে আশুতোষ এখানে গবেষণা বিভাগ স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যার ফসল শুধু জমানো নয়, বিদ্যার ফসল ফলানোর বিভাগ তৈরি করেছিলেন।[১২]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ১৯০৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতোকোত্তর পাঠক্রম চালু হয়। উদ্দেশ্য সকল কৃতী শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ করা। আর এই পন্ডিতদের ছাত্র-সমাজের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। প্রবল বিরোধ সত্ত্বেও তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন,

> 'এখন কলকাতার কৃতী অধ্যাপকেরা নানা কলেজে বিক্ষিপ্তভাবে কাজ করিতেছেন ... বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ ক্লাসগুলি যদি এরূপভাবে গঠিত হয় যে, এই দেশের যাঁহারা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অধ্যাপক, তাঁহাদিগকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অধ্যাপনার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ করা যায়, তবে সমস্ত ছাত্রই তাঁহাদের অধ্যাপনার ফল এবং উপকার পাইতে পারিবে।[১৩]

এতদিনে বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র পরীক্ষার নিয়ন্ত্রক নয়, বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র স্থলে পরিণত হয়। এই কর্মকান্ডের উচ্ছসিত প্রশংসা করে আচার্য রোলান্ডসে বলতে বিস্মৃত হননি – 'the greatest landmark in the history of the University in recent years is undoubtedly the creation of the council of postgraduate studies'।[১৪] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিক নালন্দাতে পরিণত করার উদ্যোগ নেন। প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াও জোর দেওয়া হয় পালিভাষা, ইসলামিক ইতিহাসচর্চা ও নৃতত্ত্ব-এর মত বিভাগের মত বিষয়গুলির ওপর। ধীরে ধীরে নানা বিষয়ের পঠন-পাঠন চালু হয়। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ছাত্রদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য সমকালীন পন্ডিতদের অধ্যাপনার জন্য আহ্বাণ জানান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সময়কালে আঞ্চলিকতা বর্জন করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করে। বিদেশ থেকে পন্ডিতবর্গদের আনানোর পাশাপাশি দেশীয় পন্ডিতদেরকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানানো হয়। দেশীয় ছাত্রদের মধ্যে পাশ্চাত্যবিদ্যার সঙ্গে দেশীয়বিদ্যার মেলবন্ধন ঘটাতে সফল হয়েছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বাংলার সমাজ উদ্বেলিত হয়েছিল। এগিয়ে এসেছিলো একদল ছাত্র। ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহনের প্রতি যে খামতি ছিলনা তাঁর সাক্ষ্য স্পষ্ট হয় পরিসংখ্যানে।[১৫] –

বৎসর	বার্ষিক গড় স্নাতক ছাত্র সংখ্যা
১৮৮৫-১৯০৮	৪৩৮
১৯০৯-১৯১৫	১০২৭
১৯১৬-১৯২৪	২৪৬৪

ছাত্রের পরিমান বেড়ে যাওয়া ও বিদগ্ধ অধ্যাপকমন্ডলীর উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর বৃদ্ধি পায়।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এর অপর অন্যতম উদ্যোগ হল বাংলা ভাষাকে (মাতৃভাষা) শিক্ষার বাহনে পরিণত করা। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও তিনি বাঙালি জাতি-সত্ত্বাকে ও ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হননি। বিদ্যাসাগরকে আধুনিক বাংলার জনক বললেও আশুতোষকে বাংলা ভাষার বিস্তারের পথিকৃত বলে অনেকেই মনে করেন। মাতৃভাষার আবশ্যকতা সম্পর্কে বাঙালি জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর কাছে জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার প্রধান উপকরণ হল সাহিত্য। তিনি আহ্বাণ জানান – বাঙালির যদি বিশ্ব-জগৎএ কালজয়ী হওয়ার বাসনা থাকে তবে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে হবে। মাতৃভাষার (বাংলা) সৌন্দর্যবোধকে জগৎএর মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে।

আশাবাদী ছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নির্বিশেষে বাংলা ভাষার বিস্তার নিশ্চিত হবে।[১৬] তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাচর্চা প্রচলন করার পথ মসৃণ ছিলনা। নানা প্রতিরোধ সত্ত্বেও ১৮৯১ সালে তিনি বাংলা ভাষাচর্চার প্রস্তাব করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে ইংরেজ, মুসলমান ও সংস্কৃত পন্ডিতদের প্রবল বিরোধিতায় প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। তিনি পরাস্ত হওয়ার পাত্র ছিলেন না। পনেরো বছর পরে উপাচার্য পদে এসে এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করতে উদ্যোত হন। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর আকর্ষণ কতটা ছিল, তা স্পষ্ট হয়, দীনেশচন্দ্র সেন এর বক্তব্যে,

> 'আশু বাবু আমাকে ডেকে বললেন 'দীনেশ বাবু এইবার এম. এ তে বাংলাভাষা চালাইব, সিলেবাস তৈরী করুন, এন্ডারসনকে চিঠি লিখুন, তাঁহার এ সম্বন্ধে কোন মতামত আছে কি না?' আমি বিস্ময়ের সহিত বলিলাম হঠাৎ মত পরিবর্তনের কারণ কি? তিনি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, ঢাল নাই তরোয়াল নাই যুদ্ধ করতে যাবেন! আপনাকে দিয়ে এই ৪/৫ বৎসর যাবৎ যে আমি বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের ইংরেজী ইতিহাস লিখিয়াছি ---- তাহার মানে জানেন না । এই বইগুলো না থাকিলে এম. এ পরীক্ষার্থীরা কি পড়িবে? আপনারা যতক্ষণ শোরগোল করিয়াছেন, আমি ততক্ষণ জমি তৈরি করিয়াছি'।[১৭]

বাংলা ভাষাকে নিছক শিক্ষার ভাষা নয়, প্রশাসনিক স্তরে মাতৃভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব আরোপ করেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন জাতীয়তাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে, সরকারি নির্দেশনামাকে অমান্য করে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন তখন তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে অকুণ্ঠ সমর্থন করেন।[১৮] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরকারি কোপে পড়লে, আশুতোষ সমর্থন জানিয়ে বলেন, "তুমি বাংলায় বলে ভালই করেছ, আমি চাই এখানের সরকারি লেকচার বাংলায় হোক।"[১৯] মাতৃভাষার প্রতি প্রবল ভালবাসা থেকে তিনি ব্রিটিশ শক্তির বিরোধিতা উপেক্ষা করে বাংলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ-শিক্ষা ও পরীক্ষার বিষয়রূপে বিবেচিত করেন। তাঁর সাহায্যেই বাংলা ভাষা-সাহিত্য বিশ্বের কাছে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল বলে মনে করেন সাহিত্যিক আজিজুল হক।[২০]এর পাশাপাশি ভারতের ইতিহাস ও দেশীয়চর্চার ওপর গুরুত্ব দেন। এই শিক্ষার মূল প্রেরণা ছিল ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়াতাবোধ গড়ে তোলা।

বিদ্যাসাগরের হাত ধরে বাংলায় যে নারী শিক্ষার সূচনা হয়েছিল পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত করেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন নারী শিক্ষার প্রসার ব্যতীত সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। তিনি স্ত্রী শিক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি বোর্ড গঠন করেন । এই বোর্ড নারীদের উপযোগী বিষয়গুলি নির্ধারণ করে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটান।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বপ্ন দেখতেন শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালি জাতির মেরুদন্ড ঋজু হবে। বাঙালি গৌরবের মহিমা নিয়ে বেঁচে থাকবে। বাংলার মানুষ কেবল ভাত খেয়ে বেঁচে থাকুক, তিনি কদাপি চাননি। বাংলা ও বাঙালি জাতিকে গৌরবের স্থানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি ছিলেন সদা তৎপর। জাতির এই উত্তরণের একমাত্র মাধ্যম ছিল শিক্ষা। তাঁর কর্মকান্ডের দরুন তিনি আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যোৎসাহী সমাজের নিকট সমার্থক হয়ে ওঠে। শিক্ষা নিয়ে কখনো আপোষ করেননি। তাঁর মতামত স্পষ্টভাবে জানান দিয়ে বলেন, - আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলাম তৈরি করবার যন্ত্রশালায় পরিণত হতে দেব না। আমরণ সত্যের প্রতি অনুরাগ দেখাব, স্বাধীন মনোবৃত্তির শিক্ষা দেব। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যাতে উচ্চভাব ও উচ্চ-আদর্শের প্রেরণা লাভ করতে পারে, আমরা সেই রকম শিক্ষা দেব। কিছুতেই বিশ্ববিদ্যালয়কে সেক্রেটারিয়েটের দপ্তর দ্বারা আত্মসাৎ হতে দেবনা'।[২১] রাজনীতিতে

প্রতক্ষ্যভাবে যোগদান না করলেও শিক্ষানীতি রূপায়ণের মধ্যদিয়ে দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি জানতেন শিক্ষিত জনসাধারণ যত অনায়াসে স্বাধীন হতে পারবে, অশিক্ষিতের দ্বারা তা কখনই সম্ভব নয়। তাঁর জাত্যাভিমানের পরিচয় দিয়ে মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন,- রাজদরবারে ভোজ বিবরণীতে স্যর আশুতোষের নাম কখনোই দেখা যায় নাই। কারণ এই নিমন্ত্রণ রক্ষা যে জাতীয়তা রক্ষার পরিপন্থী তাহা ভাল করিয়াই বুঝিতেন'।[২২] দেশভক্তির আর একটা পরিচয় পাই যখন, উপ-প্রদেশপাল ব্যমফিল্ড ফুলার পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। আশুবাবুর দৃঢ়তা নিয়ে ও আশুতোষ মুখোপধ্যায়-ফুলারের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব রাজদরবার থেকে সাধারণ জনমানসের ওপর মিশ্র প্রতিক্রিয়ার ছাপ ফেলে ছিলো। তাই বাংলার সাধারণ মানুষের মুখে মুখে অনুরণিত হত -

'ফুলার আর কী দেখাও ভয়?

দেহ তোমোর অধীন বটে, মনতো স্বাধীন রয়' [২৩]

১৯২২ সালের সমাবর্তনী অভিভাষণে দেশমাতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন –

'স্বদেশ আমার! তোমার সেবায় এ ব্রত লইনু আজি

পুজিতে তোমার আনিব খুঁজিয়া ধরণীর ধনরাজি।

তুমি যদি চাও প্রাণ প্রিয়ধন-দ্বিধা না জাগিবে মনে।

শুধাব না কথা, প্রফুল্ল বদনে এনে দেব ও চরণে'।[২৪]

শিক্ষাকে বৈষম্য মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। রাজশক্তির সামনে তাঁর আদর্শ ও চিন্তাভাবনাকেই প্রাধান্য দিতেন। সরকারের বিভিন্ন বৈষম্য মূলক নীতির তীব্র বিরোধীতা থেকে কখনো পিছিয়ে আসেননি। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে একতা চেয়েছিলেন। তিনি জোর দিয়েছিলেন জাতীয় ভাবগত ঐক্যের ওপর। প্রলোভন তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি, সহজে তিনি উপাচার্য পদ ত্যাগ করে ইস্পাত কঠিন হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি সাহসিকতার জন্য প্রকৃত 'বাংলার বাঘ' হয়ে উঠেছিলেন। চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য জাতীয়তাবাদী নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে 'a dynamic personality' বলে অকপটে স্বীকার করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাঙালি জাতি যে একজন অভিভাবককে হারিয়েছিলো তা সন্দেহ নেই। হারিয়ে যাওয়া যন্ত্রণা থেকে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন –

"বাঙলার শের বাঙলার বীর

বাঙলার বাণী বাঙলার বীর

সহসা-ও-পারে অস্তমান

এপারে দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত মহা-ভারতের মহাপ্রয়াণ"।[২৫]

তথ্যসূত্র :

১. শেখর বন্দোপাধ্যায়, 'পলাশি থেকে পার্টিশান' হায়দ্রাবাদ, ২০০৪,পৃ.২২৫
২. তপন রায়চৌধুরি, ' ইউরোপ পুনদর্শন' কলকাতা,১৯৯৫, পৃ.১৮
৩. দীনেশচন্দ্র সেন, 'আশুতোষ স্মৃতিকথা, ভূমিকা বারিদবরন ঘোষ, কলকাতা,২০১১, পৃ.৩০
৪. শশধর সিং, 'আশুতোষ মুখোপাধ্যায়' কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ.২০
৫. বঙ্গবাণী, আষাঢ়, ৩য় বর্ষ, ১৩৩১, পৃ.৬২১
৬. বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, কলকাতা, ২০০৭,পৃ.৩১২
৭. বিমলেন্দু কয়াল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ.৩
৮. ঐ, পৃ.২৭
৯. অনিল বিশ্বাস, আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ.৬৫
১০. শশধর সিং,ঐ , পৃ.৪০
১১. বিমলেন্দু কয়াল, ঐ, পৃ.২৮
১২. অনিল বিশ্বাস, ঐ, পৃ.৪৩
১৩. দীনেশচন্দ্র সেন, ঐ, পৃ.৫৯
১৪. J.N. Sammadar, Sir Asutosh Memorial, Part-I, patliputra,1926-1928,p-xi
১৫. Probodh Chandra Sinha, Sir Asutosh Mookherjee, A study, Calcutta, 1928, p. 225
১৬. সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, আশুতোষের ছাত্রজীবন, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ.৯৯
১৭. বঙ্গবাণী, আষাঢ়, ৩য় বর্ষ, ১৩৩১, পৃ.৫৫০
১৮. প্রশাসনিক কাজকর্ম ও সরকারি আলোচনা সব কিছুর মাধ্যম ইংরেজী ভাষা হবে বলে সরকারি নির্দেশনামা জারী করা হয়।
১৯. বঙ্গবাণী, আষাঢ়, ৪থ বর্ষ, ১৩৩২, পৃ.৬২০
২০. ঐ, পৃ.৬১৯
২১. সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ, পৃ.১১২
২২. বঙ্গবাণী, আষাঢ়, ৩য় বর্ষ, ১৩৩১, পৃ.৫৭০
২৩. অনিল বিশ্বাস, ঐ, পৃ.১৪
২৪. ঐ, পৃ.২৭
২৫. বঙ্গবাণী, আষাঢ়, ৩য় বর্ষ, ১৩৩১, পৃ.৬৩৪